আদাবুদ দ্বীন

আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ারদি রহ.
(৩৬৪-৪৫০ হি.)

অনুবাদ
যুবায়ের বিন তাহের

মাকতাবাতুল হাসান

***

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন। (সুরা মুজাদালাহ, আয়াত : ১১)

***

সূচিপত্র

লেখকের জীবনী ৭
অনুবাদকের কথা..... ১১
ইবাদত-বন্দেগি অনেক বড় নেয়ামত ১৫
বিবেকের কথা কখন মানা যাবে?..... ১৫
নবী-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য..... ১৫
সাওয়াবের আশা এবং শাস্তির ভয়..... ১৬
মুজতাহিদ আলেমগণের দ্বায়িত্ব ১৭
মানুষের ওপর আরোপিত বিধানাবলির প্রকারভেদ..... ১৮
ফরজের পাশাপাশি নফল ইবাদতের সুযোগ প্রদান ২০
ইবাদতসমূহের সুন্দর ধারাবাহিকতা..... ২০
নামাজি ব্যক্তির গুণাবলি..... ২১
নামাজের কিছু শর্তাবলি..... ২১
রোজা ২৩
জাকাত..... ২৪
হজের বিধান ২৫
হজের কিছু রহস্য বা উপকারিতা..... ২৫
শিয়াদের অভিমত ৩৪
আসেম-সহ অন্য একটি দলের অভিমত হলো..... ৩৪
সিংহভাগ কালাম শাস্ত্রবিদের অভিমত হলো ৩৪
করণীয় ও বর্জনীয় কাজে মানুষের চার অবস্থা ৩৫
ইবাদত-বন্দেগি করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে বড় দুটি মুসিবত..... ৩৯
সুস্থতা ও অবসরকে গনিমত মনে করা চাই ৪১
ইবাদত পালনে মানুষের তিন অবস্থা হয়ে থাকে..... ৪২
বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি মুক্ত ইবাদত ৪২
ত্রুটিযুক্ত ইবাদত ও তার চারটি অবস্থা..... ৪৩
চতুর্থ অবস্থাটি আবার তিন ধরনের ৪৭
ইবাদতসংশ্লিষ্ট বিধানে মানুষের তিন অবস্থার তৃতীয় অবস্থা : ইবাদত বাড়িয়ে করা.. ৪৮

রিয়া বা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ৪৮
রিয়াকারী উপহাসের পাত্র : কিছু ঘটনা; কিছু দৃষ্টান্ত ৫১
বুজুর্গদের দেখাদেখি বেশি আমল করা..... ৫৩
স্বপ্রণোদিতভাবে অধিক সাওয়াব লাভের আশায় বেশি আমল করা ৫৪
ভালো কাজে মানুষের চার অবস্থা ৫৫
বেশি নফল ইবাদতকারীদের অবস্থা দুটি..... ৫৫
বেশি ইবাদত করার জন্য তিনটি উপায়..... ৫৮
দুনিয়ার মুহাব্বতের নিন্দা..... ৫৮
দুনিয়ার মুহাব্বত ত্যাগ করার তিনটি পুরস্কার..... ৬৩
দুনিয়ার মুহাব্বতের কিছু মন্দ দিক ৬৪
দুনিয়ার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ..... ৬৬
লম্বা লম্বা আশা ছেড়ে দিতে হবে ৬৬
দুনিয়ার কিছু বাস্তবতা ৬৬
বুজুর্গদের দুনিয়া ত্যাগের কিছু ঘটনা..... ৬৯
দুনিয়ার মুহাব্বত ছাড়তে পারলে তিনটি বৈশিষ্ট্য অর্জন হবে..... ৭০
সম্পদ থাকলে তা যথাযোগ্য পাত্রে ব্যয় করা.....৭১
বুজুর্গদের নশ্বর জগতের প্রতি অনাগ্রহের আরও কিছু দৃষ্টান্ত ৭২
বাদশা হারুনুর রশিদের ঘটনা ৭৪
দুনিয়াত্যাগী সাধকদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ৭৫
কবরের বাস্তবতা.....৭৭
দুনিয়া ত্যাগে উদ্দীপক কিছু উপদেশ.....৮০
এ বিষয়ক একটি অত্যন্ত চমৎকার হাদিস ৮৪
দুনিয়া ধোঁকাবাজ.....৮৮
লম্বা লম্বা আশা করা যাবে না ৮৯
আখেরাতের প্রতি উৎসাহদানকারী একটি অত্যন্ত চমৎকার হাদিস.....৯১
কবর জিয়ারতের ফায়দা ৯২
মৃত্যুর পর জায়গা দুটিই; জান্নাত বা জাহান্নাম..... ৯৬

লেখকের জীবনী

লেখকের নাম আবুল হাসান আলি বিন মুহাম্মাদ বিন হাবিব আল-বাসরি আল-মাওয়ারদি। তিনি ৩৬৪ হিজরিতে ইরাকের বসরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রচণ্ড ইলমপিপাসু ছিলেন। নিজ জন্মভূমিতেই ফিকহশাস্ত্র শেখেন আবুল কাসেম আবদুল ওয়াহিদ বিন হুসাইন সইমারি রহ. (মৃ.৩৮৬ হিজরি)-এর নিকট। হাদিসশাস্ত্র শেখেন বিখ্যাত হাদিসবেত্তা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আদি বিন জাহর আল-মুনকিরি রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল মুআল্লা আল-আজদি রহ.-এর নিকট।

এরপর তিনি বাগদাদ গিয়ে 'দারবে জাফারানি' নামক স্থানে বসবাস করেন। সেখানে থেকে তিনি শাইখ আবু হামেদ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আসফারায়িনি রহ. (মৃ. ৪০৬ হিজরি)-এর নিকট পুনরায় ফিকহ শেখেন। আবু আলি হাসান বিন আলি বিন মুহাম্মাদ আল-জাবালি রহ. ও জাফার বিন মুহাম্মাদ ইবনুল ফজল বাগদাদি রহ.-এর নিকট পুনরায় হাদিসশাস্ত্র শেখেন।

এরপর তিনি পাঠদান ও বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন। ফলে তার সুখ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে ইলমপিপাসুরা তার নিকট ছুটে আসে। তার শাগরেদদের মধ্যে অন্যতম, আবু বকর আহমাদ বিন আলি বিন সাবেত, যিনি 'খতিবে বাগদাদি' (মৃ. ৪৬৩ হিজরি) নামে প্রসিদ্ধ। আবু বকর আহমাদ বিন আলি বিন বুদরান হালওয়ানি আল-বাগদাদি (মৃ. ৫০৭ হিজরি)। যিনি 'খালুহ' নামে প্রসিদ্ধ। সর্বশেষ যিনি তার থেকে রেওয়ায়েত করেন তিনি হলেন, আবুল ইজ আহমাদ বিন উবাইদুল্লাহ বিন কাদেশ সুলামি আল-আকবারি (মৃ. ৫২৫ হিজরি)।

অতঃপর তাকে কাজি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে তিনি ৪২৯ হিজরিতে 'আকজাল কুজাত' (সহকারী প্রধান বিচারপতি) উপাধিতে ভূষিত হন।

তার লিখিত কিতাবাদি

আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ারদি রহ. ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও ক্ষুরধার কলমের অধিকারী। এর ফলে তিনি সকল বিষয়েই উম্মাহকে ভালো ভালো গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। যেমন :

১. *আননুকাত ওয়াল-উয়ুন* নামে বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ লিখেছেন।

২. *আল-হাবিল কাবির* নামে ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থ লিখেছেন।

৩. *আল-ইকনা*। এটা *আল-হাবিল কাবির*-এর 'মুখতাসার' বা সংক্ষেপ করে লেখা।

৪. *আলামুন-নুবুওয়া*।

৫. *আমসালুল কুরআন*।

৬. *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*। এটা তার এক অনবদ্য ও অনুপম গ্রন্থ। এতে তিনি ফিকহের কিতাবাদিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি সন্নিবেশিত করেছেন। এ ছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন।

৭. *কানুনুল ওয়াজারা ওয়া সিয়াসাতুল মুলক*।

তিনি মুতাজিলা ছিলেন না

তাকিউদ্দিন ইবনুস সালাহ রহ. তাকে মুতাজিলা হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম জাহাবি রহ. বলেছেন,

«قلت: وبكلِّ حالٍ هو مع بدعةٍ فيه من كبار العلماء. فلو أنَّنا أهدرنا كلَّ عالمٍ زَلَّ لما سلِم معنا إلَّا القليل، فلا تحطّ يا أخي على العلماء مطلقًا، ولا تبالغ في تقريظهم مطلقًا وأسأل اللّه أن يتوفاك على التّوحيد»

তার মাঝে কিছু বিদআত থাকলেও সর্বসাকুল্যে তিনি একজন বড় আলেম। সামান্য পদস্খলনের কারণে যদি সকল আলেমকেই আমরা ফেলে দিই, তাহলে তো অল্প কজনই আমাদের নিকট নিরাপদ থাকবেন। অতএব, হে ভাই, ঢালাওভাবে আলেমদের অবজ্ঞা করো না এবং তাদের ভক্তি করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করো না। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহ যেন তোমাকে তাওহিদে অবিচল থাকা অবস্থায় উঠিয়ে নেন।[১]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. মাওয়ারদি রহ.-এর পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন,

«اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال في بعض المسائل بحسب ما فهمه عنه في تفسيره»

ইবনুস সালাহ রহ. তার তাফসির পড়ে যা বুঝেছেন সে অনুযায়ী তার ওপর মুতাজিলা হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন।[২]

---

১. জাহাবি, *তারিখুল ইসলাম*, ৩০/২৫৬।

২. ইবনে কাসির, *তাবাকাতুল ফুকাহায়িশ শাফিয়্যিন*, ১/৪১৯।

কিন্তু 'খাতেমাতুল মুহাককিকিন' আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. খুব ইনসাফপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

«ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال. والمسائل التي وافق فيها المعتزلة معروفة. منها: مسألة وجوب الأحكام والعمل بها هل هي مستفادة من الشرع، أو العقل؟ كان يذهب إلى أنها مستفادة من العقل»

তাকে মুতাজিলা নামে আখ্যায়িত করা সমীচীন নয়। ...তবে যেসব মাসআলায় তিনি মুতাজিলাদের সাথে একমত হয়েছেন সেগুলো তো প্রসিদ্ধ। যেমন: বিধানাবলি এবং সে অনুযায়ী আমল করার ওজুব (আবশ্যকীয় হওয়া) আকল থেকে অর্জিত; শরিয়ত থেকে নয়।[৩]

তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। 'আকজাল কুজাত' হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দুনিয়াবিমুখ ও প্রশংসাবিমুখ ছিলেন। বলা হয় তিনি স্বরচিত গ্রন্থগুলো (জীবদ্দশায়) প্রকাশ করেননি। কেননা, সেগুলো খালেস নিয়তে একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়েছে কি না এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেননি। ফলে উপস্থিত একজন লোককে অসিয়ত করে গেছেন, আমার মৃত্যুর সময় তুমি তোমার হাত আমার হাতের ওপর রাখবে। তখন যদি আমি তোমার হাত মুঠ করে ধরে চাপ দিই, তাহলে মনে করবে আমার এ গ্রন্থগুলোর কোনোটিই কবুল হয়নি। সুতরাং তখন সব গ্রন্থ দজলা নদীতে ফেলে দেবে। আর যদি হাত খুলে রাখি এবং তোমার হাত মুঠ করে না ধরি তাহলে বুঝবে, এগুলো কবুল হয়েছে। আমি আমার নিয়তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি।

সে ব্যক্তি বলেন, যখন তার মৃত্যু সন্নিকটে এলো; আমি আমার হাত তার হাতের ওপর রাখলাম। কিন্তু তিনি তার হাত খুলে রাখলেন, আমার হাত মুঠ করে ধরলেন না। ফলে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা কবুল হওয়ার আলামত। তাই তার মৃত্যুর পরই সেগুলো ছেপে দিয়েছি।

তার ব্যাপারে আলেমগণের প্রশংসা

তার ছাত্র 'খতিবে বাগদাদি' রহ. বলেন,

«كَانَ من وُجُوه الْفُقَهَاءالشافعيين كتبت عَنهُ، وَكَانَ ثِقَة»

তিনি শাফেয়ি ফকিহদের মাঝে শীর্ষস্থানীয়। আমি তার কাছ থেকে (হাদিস ও ইলম) লিপিবদ্ধ করে সংগ্রহ করেছি। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন।[৪]

---

৩. *লিসানুল মিজান*, ৬/২৫-২৬।

৪. খতিবে বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, ১২/১০১।

ইয়াকুত আল-হামাবি বলেন,

«وكان عالما بارعا متفننا»

তিনি বহুশাস্ত্রবিদ, দক্ষ আলেম ছিলেন।

তিনি তার থেকে এ কথাটি বর্ণনা করেন,

قال: سمعت الماوردي يقول: بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة، واختصرته في أربعين، يريد بالمبسوط «كتاب الحاوي» وبالمختصر «كتاب الاقناع»

আমি ফিকহ শাস্ত্রকে চারহাজার পৃষ্ঠায় বিস্তারিত লিখেছি। অতঃপর চল্লিশে সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করেছি। এ কথা বলে তিনি তার লিখিত الحاوي الكبير এবং الإقناع-কে বুঝিয়েছেন।[৫]

তাজুদ্দিন সুবকি রহ. বলেন,

«كَانَ إِمَامًا جَلِيلًا رفيع الشَّأْن لَهُ الْيَد الباسطة فِي الْمَذْهَب والتفنن التَّام فِي سَائِر الْعُلُوم»

তিনি মহান ইমাম। সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। মাজহাবের ব্যাপারে তার ব্যাপক জানাশোনা ছিল। সব শাস্ত্রে ছিল তার পূর্ণ বিচরণ।[৬]

তার ইনতেকাল

তিনি মঙ্গলবার, রবিউল আওয়াল মাসের শেষদিন, ৪৫০ হিজরিতে ইনতেকাল করেন। তখন তার বয়স ৮৬ বছর হয়েছিল। খতিবে বাগদাদি তার জানাজা পড়েছেন। পরদিন রবিউস সানির প্রথম তারিখে তাকে বাগদাদের 'বাবে হারব' কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন।

* * *

৫. *মুজামুল উদাবা*, ৫/৩৬৭।

৬. *তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যা আল-কুবরা*, ৫/২৬৮।

অনুবাদকের কথা

حامدًا و مصليًا و مسلمًا أما بعد..

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া, যিনি তার সীমাহীন দয়া ও অপরিসীম মেহেরবানি দ্বারা এই অনভিজ্ঞ, অধম ও অযোগ্য বান্দাকে টুটাফাটা কিছু লেখনীর মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

এ বইটি জগদ্বিখ্যাত দ্বীনি ও ইলমি ব্যক্তিত্ব, মহান ইমাম, আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ারদি (মৃ. ৪৫০ হিজরি) রহ.-এর অনবদ্য গ্রন্থ *আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ-দ্বীন*-এর আদাবুদ দ্বীন অধ্যায়ের সরল বাংলা অনুবাদ।

লেখক মূল আরবি গ্রন্থটিকে পাঁচটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে সুবিন্যস্ত করেছেন।

প্রথম অধ্যায় : ফাজলুল আকলি ওয়া জামমিল হাওয়া

দ্বিতীয় অধ্যায় : আদাবুল ইলম

তৃতীয় অধ্যায় : আদাবুদ দ্বীন

চতুর্থ অধ্যায় : আদাবুদ দুনিয়া

পঞ্চম অধ্যায় : আদাবুন নাফস

এবং পরিশিষ্ট

প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার বিবেচনায় সবগুলো অধ্যায়ই অনূদিত হয়ে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে চলে আসার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব বহন করে। তবে সমধিক গুরুত্বের বিবেচনায় এবং অন্যান্য অধ্যায়ের তুলনায় এই অধ্যায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা প্রথম এটিই অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছি। পাঠকমহলের পক্ষ থেকে সাড়া পেলে অন্যান্য অধ্যায়গুলোও শিগগির অনুবাদ করে পাঠক সমীপে পেশ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও নৈতিকতা শিক্ষাদান বিষয়ক নসিহত ও উপদেশ। তবে মাঝে মাঝে লেখক যুক্তিতর্কের আলোকে বিভিন্ন দ্বীনি বিষয়ে মানুষের মনে উদয় হওয়া নানা সংশয়ের দলিলভিত্তিক সুন্দর নিরসনও করেছেন। এ গ্রন্থের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে লেখক সাহাবি, তাবেয়ি এবং তাবে তাবেয়িগণসহ অনেক পূর্বসূরির ব্যাপক অর্থবহ

প্রচুর উপদেশবাণী সন্নিবেশিত করেছেন। লেখক হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর পাঁচ দশকের একজন মহান মনীষী। কিন্তু তার উপস্থাপনাশৈলী এতটাই চমৎকার যে, আজ (১৪৪২ হিজরি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ) আমরা যারা তার পাঠক, আমাদের কাছে মনেই হয় না যে, তিনি প্রাচীন একজন লেখক! বরং পাঠকমাত্রই এটা অনুধাবন করতে পারবেন যে, যেন একজন মহান মুর্শিদের সামনে আপনি বসে আছেন। তিনি আপনার সমস্যাগুলো একেক করে তুলে ধরছেন এবং তার সমাধানের পথ বাতলে দিচ্ছেন। আপনার-আমার গাফলতগুলো একেক করে তুলে ধরছেন এবং তার ওপর সতর্ক করছেন।

বিশেষত 'আদাবুদ দ্বীন' অধ্যায়ে তিনি ইবাদতসমূহের উৎস, ইবাদতের প্রকারভেদ, প্রত্যেক প্রকার ইবাদতের রহস্য ও উপকারিতা, শরিয়ার বিভিন্ন আদেশ-নিষেধের রহস্য ও উপকারিতা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব, বিধান, কর্মপদ্ধতি ও উপকারিতা, শরিয়া অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রে কোন কোন জিনিস বাধা হয়, সেগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় কী, ইবাদত-বন্দেগি পালনের ক্ষেত্রে মানুষের বৈচিত্র্যময় অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে খুব দরদমাখা ভঙ্গিতে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের শেষে তিনি মন-চাই জিন্দেগি ছেড়ে দেওয়া, দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, দুনিয়ার তিক্ত বাস্তবতা অনুধাবন করা, দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা কমানো ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনাঞ্জাপক সারগর্ভ ও যৌক্তিক আলোচনা করেছেন। তিনি কবিতাপ্রেমী ছিলেন। তাই এই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি তার পছন্দের কবিদের নানা কবিতা উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, সার্বিক বিবেচনায় তার এই গ্রন্থ আপন বিষয়ে এক অসাধারণ প্রয়াস!

অনুবাদসংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা, যা আমরা পাঠকমহলকে বলে দেওয়া সমীচীন মনে করছি :

১. বইটির অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা মূল গ্রন্থের দুটি মুদ্রিত কপি সামনে রেখেছি। ক. দারুল মিনহাজ, বৈরুত, লেবানন থেকে মুদ্রিত। খ. দারু ইবনিল জাওযি, কায়রো, মিশর থেকে মুদ্রিত। মাঝেমধ্যে মাকতাবায়ে শামেলাতেও চোখ বুলিয়েছি।

২. পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের অনুবাদ নেওয়া হয়েছে মুফতি শফি রহ. রচিত ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ. কর্তৃক অনূদিত *মাআরিফুল কুরআন* থেকে।

৩. লেখক এ গ্রন্থে হাদিস ও আসার উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো মানদণ্ডকে সামনে রাখেননি। তাই এতে সহিহ, হাসান, জয়িফ সব ধরনের হাদিসই রয়েছে। এমনকি কিছু 'মউজু' বর্ণনাও চলে এসেছে বলে অনেকের ধারণা। তবে এখানে প্রতিটি হাদিসের সূত্রের মান যাচাই করা হয়নি। আমরা শুধু মূল আরবি নুসখার টীকা থেকে হাদিসগুলোর তথ্যসূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি। অতএব, বিশেষ কোনো হাদিসের মান নিয়ে কারও মনে সংশয় হলে সে ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই পৃথক গবেষণার দাবি রাখে।

৪. হাদিসসমূহের মূলপাঠ এবং কবিতাসমূহের মূলপাঠ মাকতাবায়ে শামেলা থেকে নেওয়া হয়েছে।

৫. কবিতার অনুবাদ মাঝে মাঝে কাব্যাকারে করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে নানা কারণে সবগুলোর ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়নি।

আরেকটি কথা, বইটি নির্ভুল করার জন্য অনুবাদক, নিরীক্ষক, প্রকাশক কারও পক্ষ থেকেই চেষ্টায় ত্রুটি করা হয়নি। সর্বাত্মক চেষ্টার পরও মানবিক সীমাবদ্ধতার দরুন কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাই তথ্য-উপাত্ত বা মুদ্রণজনিত কোনো ভুল থাকলে পাঠকের নিকট তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে শুধরে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

সবশেষে কয়েকজন ব্যক্তিকে আমি কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করতে চাই। মুহতারাম মাওলানা ফারুকুযযামান সাহেব (দা. বা.), আদিব, মাদানীনগর মাদরাসা। আমার প্রিয় উস্তাদ। যার হাত ধরে আমার লেখালেখির হাতেখড়ি। স্মরণ করছি বন্ধুবর মুহাম্মাদ হুসাইন ভাই ও মুহাম্মাদ শাকিল ভাইকে, যারা গ্রন্থটি হাতে দিয়ে অনুবাদের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'মাকতাবাতুল হাসান'-কে যারা বইটি প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়ে আমার মতো নবীন অনুবাদককে পথচলার উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন। এ ছাড়াও না বলা অনেকের দ্বারা আমি সহযোগিতা পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন এবং এর উপকারিতা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করুন। আমিন।

و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله وصحبه أجمعين.

বিনীত

যুবায়ের বিন তাহের

ইবাদত-বন্দেগি অনেক বড় নেয়ামত

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। কিছু ইবাদত-বন্দেগি ফরজ করেছেন এবং যুগে যুগে নবী-রাসুলগণকে প্রেরণের মাধ্যমে বান্দাদের জন্য স্বীয় মনোনীত ধর্মকে অবশ্যপালনীয় করেছেন। তবে এগুলোর কোনোটাতেই কিন্তু আল্লাহর কোনো প্রয়োজন বা কোনো চাওয়া-পাওয়া নিহিত নেই। এগুলো বান্দাদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে নিছক করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধরে নেওয়া যায়, আল্লাহর দেওয়া অগণিত নেয়ামতের মধ্য থেকে এগুলো হচ্ছে উল্লেখযোগ্য কিছু নেয়ামত। বরং এভাবে বললে অতিরঞ্জন হবে না যে, ধর্ম, ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং ফরজ ও নফল ইবাদতগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। কারণ, অন্যান্য নেয়ামতগুলোর ভোগের জায়গা শুধুই দুনিয়া। এবং ধর্মসংশ্লিষ্ট নেয়ামতগুলোর সুফল মানুষ দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই ভোগ করবে। আর আল্লাহ মানুষের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন, সেগুলো যেমনইভাবে দলিলসিদ্ধ, তেমনইভাবে অনুসৃত বিবেকের পরিপন্থীও নয়।

বিবেকের কথা কখন মানা যাবে?

বিবেকের কথা শোনা হয় যে ক্ষেত্রে শরিয়ত তা থেকে বারণ করে না, আর বিবেক যা থেকে বারণ করে না সে ক্ষেত্রে ধর্মের কথা শুনতে বাধা কোথায়?

কারণ ইসলামি শরিয়তের কোনোকিছুই বিবেকপরিপন্থী নয়। আর শরিয়তের নিষিদ্ধ বিষয়ে বিবেকের কথা শোনার বৈধতাই নেই। এজন্যই শরিয়তের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে কেবল পরিপূর্ণ বিবেকসম্পন্ন লোকদেরই ওপর।

নবী-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসুলগণকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, অন্য সকল মতাদর্শের ওপর স্বীয় মনোনীত ধর্মকে বিজয় দান করা, এতে কাফেরদের গায়ে যতই জ্বালাপোড়া হোক। আল্লাহর কিছুই যায় আসে না।

রাসুলগণ এসে মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। নিজ নিজ সত্যবাদিতা প্রমাণ করেছেন। শরিয়তের বিধানগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ পড়ে শুনিয়েছেন। কোনটা হালাল, কোনটা হারাম, কোনটা বৈধ, কোনটা অবৈধ, কোনটা পছন্দ করেন, কোনটা অপছন্দ

করেন, কোন কাজ আল্লাহ করতে বলেছেন, আর কোনটা করতে নিষেধ করেছেন, অনুগত বান্দাদের জন্য প্রতিদানের কী প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন এবং নাফরমানদের জন্য কী কী শাস্তির ভীতিপ্রদর্শন করেছেন; এ সবই রাসুলগণ একেবারে সুস্পষ্টরূপে উম্মাহকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ﴾

যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। আর তোমাদের শিক্ষা দেয় এমনকিছু যা তোমরা জানতে না।[৭]

সাওয়াবের প্রতিশ্রুতিগুলো আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে; আর শাস্তির ভয়ে মানুষ অপরাধ থেকে বাঁচে। ব্যস, মানুষের দায়িত্ব এটুকুই; করণীয় কাজগুলো করা এবং বর্জনীয় কাজগুলো থেকে বিরত থাকা।

সাওয়াবের আশা এবং শাস্তির ভয়

এজন্যই বিধানাবলির সাথে সাওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয়কে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ যে তাঁর নাজিলকৃত গ্রন্থে পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনাবলি শুনিয়েছেন এবং পূর্ববর্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাহিনি বলেছেন, সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন সেগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। এতে করে মানুষের প্রাপ্তির আশা বেড়ে যাবে এবং শাস্তির ভয় বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং ঘটনাগুলোর বিবরণ দেওয়াও আমাদের ওপর আল্লাহর অনেক বড় এক করুণা। সত্যিই আল্লাহর নেয়ামতরাজি গুণে শেষ করা এক অসাধ্য ব্যাপার!

তারপর সেইসাথে আল্লাহ স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দায়িত্ব দিয়েছেন, যেন তিনি আল্লাহর গ্রন্থের (তথা কুরআনের) সংক্ষিপ্ত কথাগুলোকে খুলে খুলে বর্ণনা করেন। কঠিন কথাগুলোকে সহজবোধ্য করে বলে দেন এবং দ্ব্যর্থবোধক কথাগুলোর সুন্দর ব্যাখ্যা বলে দেন। এতে তাঁর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজ বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠবে এবং নবীর হাতে কতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাও বোঝা যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

---

[৭]. সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫১।

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আপনার কাছে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ওইসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।[৮]

মুজতাহিদ আলেমগণের দায়িত্ব

নবীজির পর আল্লাহ উম্মতের মুজতাহিদ আলেমদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ তারা নবীজির বাতলানো পদ্ধতি ও নিয়মনীতি বজায় রেখে কুরআন থেকে বিধান আহরণ করবেন। এর দ্বারা তারা কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের সঠিক মর্ম উদঘাটন করতে সক্ষম হবেন এবং উম্মাহর অন্য সদস্যদের চেয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের চেষ্টা-মেহনতের বদলা হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননাও পাবেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন।[৯]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾

আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর।[১০]

সুতরাং কুরআন হলো মৌলিক গ্রন্থ। আর হাদিস হলো তার ব্যাখ্যা। মুজতাহিদ আলেমগণ এ দুটোকে সামনে রেখেই এবং এ দুটোর আলোকেই দৈনন্দিন জীবনের বিধিবিধানগুলো উম্মতের সামনে আরও সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলে ধরেছেন।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন,

---

৮. সুরা নাহল, আয়াত : ৪৪।
৯. সুরা মুজাদালাহ, আয়াত : ১১।
১০. সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ০৭।

«اَلْقُرْاٰنُ : أَصْلُ عِلْمِ الشَّرِيْعَةِ، نَصُّهُ وَدَلِيْلُهُ»

কুরআন হলো ইলমে শরিয়তের মূল। এর পাঠই স্বয়ং তার দলিল।[১১]

নবীজির ব্যাখ্যাগুলো হলো হেকমত। কিন্তু কিছু হতভাগা লোক এগুলো মানে না। উম্মতের মাননেওয়ালা জামাতই তাদের বিরুদ্ধে দলিল।

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনেক বড় একটি করুণা হলো, তিনি তাদের ওপর যেসব বিধান আরোপ করেছেন, সেগুলো পালনের সক্ষমতাও তাদেরকে দিয়েছেন। সেগুলো পালনে যত সমস্যা হতে পারে তা-ও দূর করে দিয়েছেন। যেন তারা আনুগত্যের দিকে ঝোঁকে এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকে। দুনিয়ার কোনো ভোগের বস্তু যেন তাদের প্রতারিত করতে না পারে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না।[১২]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

আর ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।[১৩]

মানুষের ওপর আরোপিত বিধানাবলির প্রকারভেদ

মানুষের ওপর আরোপিত বিধানগুলো তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ।

(১) আকাইদ, যেগুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

(২) কিছু কাজ করতে বলেছেন।

(৩) কিছু কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

সবগুলো বিধান একইরকম হলে সেগুলো পালন করতে একঘেয়েমি চলে আসার সম্ভাবনা ছিল। তাই মেনে চলতে সহজ হওয়ার জন্য তিন রকম করে দিলেন। এটা যেমনই আল্লাহর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ, তেমনই আমাদের প্রতি তার দয়া ও করুণার এক অনুপম বহিঃপ্রকাশ!

---

১১. *আল-বাসাইর ওয়ায-যাখাইর*, ২/২০৯।

১২. সুরা বাকারা : ২৮৬।
এক কেরাত অনুযায়ী উক্ত অর্থটি হবে।-সম্পাদক

১৩. সুরা হজ, আয়াত :৭৮।

আকিদাগুলোও আবার দু-প্রকার :

(১) ইতিবাচক, যেমন : আল্লাহর একত্ববাদকে মানা, তাঁর সিফাতগুলো মানা, তাঁর প্রেরিত নবী-রাসুলদের সত্য মানা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার আনীত শরিয়তসহ বিশ্বাস করা।

(২) নেতিবাচক, যেমন : এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর কোনো স্ত্রী-পুত্র নেই, কিছুর প্রয়োজন নেই, এমনইভাবে তিনি সমস্ত মন্দ থেকে মুক্ত।

একজন পূর্ণাঙ্গ বিবেকসম্পন্ন মানুষের ওপর আরোপিত বিধানগুলোর মাঝে আকিদা-বিশ্বাসসংশ্লিষ্ট এ প্রকার দুটোই প্রথম গ্রহণীয়।[১৪]

এরপর আসে করণীয় বিধানগুলোর ধারা। সেগুলো তিন ধরনের :

(ক) শারীরিক, যেমন : নামাজ, রোজা।

(খ) আর্থিক, যেমন : জাকাত, কাফফারা।

(গ) শারীরিক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বয়ে, যেমন : হজ, জিহাদ ইত্যাদি।

এভাবে ভাগ ভাগ করে দেওয়াতে মানুষের জন্য বিধানগুলো পালন করা সহজ হয়ে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে! আল্লাহ মানুষের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি কতভাবে খেয়াল করেছেন!

শুধু কি তাই? যে কাজগুলো করতে বারণ করেছেন সেগুলোও তিন প্রকার :

(ক) ওই সমস্ত কাজ যেগুলো মানুষের দেহ-প্রাণ রক্ষার্থে করতে বারণ করেছেন। যেমন : হত্যা, হারাম খাওয়া, বিষপান, মদ্যপান (যা শুধু বিবেককে নষ্টই করে না, বরং তার বিলুপ্তি ঘটায়)।

(খ) ওই সমস্ত কাজ যেগুলো থেকে বারণ করেছেন; মানুষের মাঝে পারস্পরিক মিল-মহব্বত ও বন্ধন জিইয়ে রাখার জন্য। যেমন : রাগ করা, অন্যায়ভাবে প্রভাব খাটানো, জুলুম করা, আত্মীয়তা ছিন্ন করা, অনর্থক শত্রুতা পোষণ ইত্যাদি।

(গ) কিছু কিছু কাজ করতে বারণ করেছেন মানুষের বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য ও মাহরামদের সম্মান বজায় রাখার জন্য। যেমন : ব্যভিচার, মাহরাম নারী-পুরুষের মধ্যকার বিয়ে ইত্যাদি।

আসলে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সবগুলোই আমাদের জন্য অনেক বড় বড় নেয়ামত। কেউ মনোযোগ দিয়ে একটু ভাবলে অবাক না হয়ে পারবে না। কারণ,

---

[১৪]. কারও কোনোকিছু মানা না-মানা নির্ভর করে আদেশ-নিষেধকারীর পরিচিতি। পরিচয়ের পরেই মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়, তার কথা মানবে কি মানবে না।